Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-II, published on April 2021, Page No. 1 –8
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলকাব্য : নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিবাদীসত্তার আখ্যান

মিজানুর মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: Mizanurmondal07@gmail.com

Keyword
নারীবাদ, প্রতিবাদিনী, মনসা, মঙ্গলকাব্য, আত্মপ্রতিষ্ঠা, কেতকাদাস, প্রাগাধুনিক

Abstract
উনিশ শতকেই আমাদের পরিচয় ঘটল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। অনেকে এই সময়ে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। ফলত নৈতিক কারণেই মেয়েদের প্রতিও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। উনিশ শতকেই নবচেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল, মেয়েদের জীবনযাত্রার মানোয়ন্নের নানা সামাজিক উদ্যোগ। সতীদাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, প্রভৃতির বিরুদ্ধে ও বিধবাবিবাহের পক্ষে একদিকে যেমন আন্দোলন দানা বাঁধল, তেমনি অন্যদিকে পুথিগত শিক্ষায় মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য গড়ে তোলা হল বিভিন্ন বিদ্যালয়। ধীরে ধীরে দিন যত এগিয়েছে ফেমিজম এর ধারণা তত সুদৃঢ় হয়েছে। বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে আলাদা আলোচনা, লেখা-লিখি যথেষ্ট হচ্ছে।এইভাবে নারীপ্রগতির ভাবনা ক্রমশ গতি পেতে থাকে এবং স্ত্রী শিক্ষার বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা আইন জারি হয়। ফলে নারীর মনন ও চিন্তনে নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজকের নারীবাদ ও নারীবাদীদের চিন্তাভাবনা, আন্দোলন এটা ঠিকই আছে। তবে আমরা যদি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করি তাহলে দেখা যাবে উনিশ একুশ শতকে নয়, নারীকে মানবী হিসাবে দেখা, তার স্বাধীনচেতনা স্বাতন্ত্র্যবোধ মধ্যযুগের সাহিত্যেও বিভিন্ন ধারায় টুকরো ভাবে এসেছে। একটু যদি পিছিয়ে যাই আমরা তাহলে লক্ষ করবো প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের নারীরাও ছিলেন অনেকটাই সাহসী ও ব্যতিক্রমী। তারাও ছিলেন যথার্থই প্রতিবাদিনী। সমাজের নানা সংস্কারের মধ্যেও, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবাদের সুর তাঁদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে আজকের দিনের মত সামাজিক নানা আন্দোলনের প্রভাব কিন্তু সমাজে তখন প্রভাব ফেলেনি। তবুও মধ্যযুগের বিভিন্ন কবিদের কাব্যে বিক্ষিপ্তভাবে নারীর প্রতিবাদী রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। তবে গভীরভাবে এসেছে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে।

সূচনা :

নারী একটি মানুষ, তারও একটি মানবীসত্তা আছে। সেও রক্ত মাংসের গড়া একটি শরীর, পুরুষের মত তারও ভালোলাগা মন্দলাগা সব মিলিয়ে তারও একটি পরিচয় আছে। মেয়েদের এই জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমাদের আলাদা করে মাথা ব্যথা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে নবচেতনার প্রেক্ষিতে। উনিশ শতকেই আমাদের পরিচয় ঘটল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। অনেকে এই সময়ে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। ফলত নৈতিক কারণেই মেয়েদের প্রতিও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। উনিশ শতকেই নবচেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল, মেয়েদের জীবনযাত্রার মানোয়ন্নের নানা সামাজিক উদ্যোগ। সতীদাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, প্রভৃতির বিরুদ্ধে ও বিধবাবিবাহের পক্ষে একদিকে যেমন আন্দোলন দানা বাঁধল, তেমনি অন্যদিকে পুথিগত শিক্ষায় মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য গড়ে তোলা হল বিভিন্ন বিদ্যালয়। ধীরে ধীরে দিন যত এগিয়েছে ফেমিজম এর ধারণা তত সুদৃঢ় হয়েছে। বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে আলাদা আলোচনা, লেখা- লিখি যথেষ্ট হচ্ছে। এইভাবে নারীপ্রগতির ভাবনা ক্রমশ গতি পেতে থাকে এবং স্ত্রী শিক্ষার বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা আইন জারি হয়। ফলে নারীর মনন ও চিন্তনে নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯২ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্যে আমরা এই আত্মচেতনার কিছুটা ধারণা পাই। এখেনে নারী আত্মবিশ্বাসী সুরে গেয়ে উঠেছেন-

'আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী
নহি দেবী, নহি সামান্য নারী।'[১]

সেদিনের প্রেক্ষিতে এই দৃঢ় মানসিকতা সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকের নারীবাদ ও নারীবাদীদের চিন্তাভাবনা, আন্দোলন এটা ঠিকই আছে। তবে আমরা যদি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করি তাহলে দেখা যাবে উনিশ একুশ শতকে নয়, নারীকে মানবী হিসাবে দেখা, তার স্বাধীনচেতনা স্বাতন্ত্র্যবোধ মধ্যযুগের সাহিত্যেও বিভিন্ন ধারায় টুকরো ভাবে এসেছে। একটু যদি পিছিয়ে যাই আমরা তাহলে লক্ষ করবো প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের নারীরাও ছিলেন অনেকটাই সাহসী ও ব্যতিক্রমী। তারাও ছিলেন যথার্থই প্রতিবাদিনী। সমাজের নানা সংস্কারের মধ্যেও, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবাদের সুর তাঁদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে আজকের দিনের মত সামাজিক নানা আন্দোলনের প্রভাব কিন্তু সমাজে তখন প্রভাব ফেলেনি। তবুও মধ্যযুগের বিভিন্ন কবিদের কাব্যে বিক্ষিপ্তভাবে নারীর প্রতিবাদী রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। তবে গভীরভাবে এসেছে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলকাব্যে।

কোথায় কীভাবে এই নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে সেটাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য কাব্যে প্রান্তিক মানবিক ধীরে ধীরে বিরুদ্ধ শক্তির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, যা আমরা মনসার মধ্য দিয়ে দেখি। আমরা জানি মনসার পরিচয়। সমাজ তাকে পরিত্যাগ করেছে। তার কোন জাত কূল নেই। দেবসভায় তার ঠাই নেই, সে ব্রাত্য। প্রচলিত সূত্র থেকে আমরা জানি সে শিবের মানসকন্যা, পদ্মপাতায় তার জন্ম। জন্মের পর নিজের পিতাই কামবিবশরূপে তাকে ধরতে যায়। কিন্তু শিব পূর্বকথা বিস্মৃত হলেও মনসা তার জন্ম ইতিহাস জানে, তাই পিতাকে বলেছে-

'পিতা হয়্যা দুহিতারে ভজিবে কেমনে।
কলঙ্ক রাখিবে বাপা সয়াল ভুবনে।।'[২]

কন্যার কথা শুনে শিব নিরস্ত হয়েছেন। ধীরে ধীরে মনসা বড় হচ্ছে। সেখানে তার বিমাতা চণ্ডী রয়েছে। কিন্তু সৎমা তাকে দেখেই সন্দেহ করে, সপত্নী ভেবে ক্রোধে বাক্যবাণে জর্জরিত করে। শুধু তাইই নয়, পাশাপাশি আগুনের ছেঁকা দিয়ে মনসার বামচক্ষু চিরতরে নষ্ট করে দেয়। এক্ষেত্রে চণ্ডী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মনসার ওপর অবিবেচকের কাজ করেছেন। এমনকি চণ্ডী কোনদিনই মনসাকে কন্যারূপে স্বীকৃতি দেয়নি। বিমাতার ষড়যন্ত্র থেকে বিবাহের বাসরেও

রেহাই পায়নি মনসা। বিবাহের পর মনসা জরৎকারু নিশিযাপনের জন্য বাসর ঘরে গেলে, চণ্ডী ঘরে মায়াভেক ছেড়ে দেন। এরফলে মনসার নাগেরা বেড়িয়ে আসে। ভয়ে জরৎকারু মুনি মনসাকে পরিত্যাগ করেন-

'চণ্ডীর কৌতুকে দেখিয়া মণ্ডূক।
উঠিল গজ্জ্যা।।
আশে পাশে ফণী ত্রাসে মহামুনি।
তেজিল পুষ্পের শয্যা।।'[৩]

শিবের সংসারে বিমাতা চণ্ডীর দ্বারা নির্মমভাবে লাঞ্চনা তার আর সহ্য হয় না। শেষ পর্যন্ত মনসাও চণ্ডীর পায়ে দংশন করে, হত করে দিয়েছিল। অবশ্য পরে কৌশলী পিতার অনুরোধে বিমাতার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল।

আবার তার নামও সমাজ দিয়েছে কানি চেংমুড়ি- 'বাপন ভাতারী বেটি চ্যঙ্গমুড়ি কানি।'[৪] আসলে নামটি চাপা পড়ে যায় নাম যখন বিশেষণ হয়। তার অবস্থানও আমরা জানি। তখন মনসা ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অধীকার পাওয়ার জন্য লড়াই করেছে। মনসা এবার নিজেই পুজা লাভের বাঞ্ছা করছেন। মনসার নিজের কোথাও মনে হচ্ছে এবার একটা স্থান দরকার। কেননা তার পিতা মহাদেব চৌদ্দ ভুবনের স্থিতি। তাঁর কন্যা হয়ে কেও তাঁকে পুজে না। ভালোমত জানেনা তার পরিচয়। এইভাবে একটি বঞ্চনার যন্ত্রণা মনসাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। এবার তিনি নিজেই মাঠে নেমে পড়লেন-

'শুনহ বহিনী নেত কিছু নহে করিযত ।
যদি পূজা নহে ত্রিভুবনে
আকাশ পাতাল ভূমি ব্যপিত করিয়া ফণী
মনসা জানাব জগজনে।।'[৫]

এবার মনসার প্রতিপক্ষ হিসাবে এসেছে চাঁদ সওদাগর। অর্থনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে চাঁদ যেভাবে এসেছে মনসা সাংস্কৃতিক দিক থেকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। স্বাভাবিক কারণে তাঁর নৌকা ডুবিয়েছে, ভিক্ষাবৃত্তি করে ছেড়েছে-

'বুদ্ধি বল নেত গ উপায় বল মোরে।
নহিল আমার পূজা চাম্পাই নগরে।।
নেত বলে ডাক তুমি বীর হনুমান
খরতর খড়্গ তারে দেহ খরতরা
হনুমান কাটে যেন চাঁদের নাখররা।।'[৬]

মনসার কোপে ধন্বন্তরি মরল, তবুও চাঁদ সদাগর মনসার পুজা করে না। মনসা এবার চাঁদকে বড় আঘাত দিতে বেছে নিল চাঁদের ছয় পুত্রকে। মনসা এবার স্নেহ বাৎসল্যের মূলে কঠোর আঘাত করতে চাইল। ভেবেছিল এতেই বোধহয় চাঁদ দুর্বল হয়ে তাঁর পুজা করতে বাধ্য হবেন। এই জন্যই তিনি বিঘতিয়া নাগকে পাঠাল চাঁদের বাড়ি। সে চুপিসারে চাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করে অন্নে বিষ উগরে দিয়ে আসে। সেই অন্ন ভোজন করে চাঁদের ছয় পুত্র একই সঙ্গে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ল। এই লড়াই আরো চূড়ান্ত হয় লখিন্দরের বিয়েতে। সেখানে আমরা লক্ষ করেছি বাসর ঘরে ঢুকবার জন্য কোন ছিদ্র নেই। কিন্তু মনসা চাঁদ সদাগরকে জব্দ করতে শেষ পর্যন্ত কালনাগিনীকে দায়িত্ব দিয়েছে-

'তিন সর্প পাঠাইলু কেহ না আইল।
শেষভাগ রাত্রে বলে ভুজঙ্গ জননী।
লখীন্দরে খাত্যে চল এ কালনাগিনি।।'[৭]

অতঃপর যখন বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে দেবসভায় হাজির হলেন, নাচে গানে দেবতাদের মন সন্তুষ্ট করেছে। তখন নেতা ধোপানী মনসাকে দেবসভায় আনলেন। নরমে গরমে দেবসভায় প্রত্যেকে মনসাকে সাদরে আহ্বান করেছে, জায়গা ছেড়ে দিয়েছে-

'সখীর বিনয় দেবী এড়াইতে নারি।
দেবসভায় গেলা জয় বিষহরী।।
মনসা দেখিয়া সভে করিল আদর।
সিংহাসনে বসাইল সভার ভিতর।।'[৮]

দেবসভায় সকলে অনুনয়, বিনয় করে বারবার অনুরোধ করেছে মনসাকে, লখিন্দরকে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে। সে ফিরিয়ে দিয়েছে। এমনকি স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে চাঁদ সদাগর মনসার পুজাও করেছেন। এইভাবেই আমরা দেখি মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সে জায়গা ফিরে পেয়েছে।

নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই আমরা সনকা ও বেহুলার মধ্যেও লক্ষ করি। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে– কাহিনির মধ্যে প্রথম সাক্ষাতেই দেখা যায়, সনকা মনসা দেবীর পরিচয় জানতে পেরে পূজার আয়োজন করেন। প্রতিবেশী জালু–মালুর পরিবারে উন্নতি দেখে, উন্নতির কারণ জানতে চাইলে জালু-মালুর মায়ের নিকট মনসা দেবীর কৃপার কথা শোনেন। সনকাও নিজ পরিবারের মঙ্গলকামনায় মনসা পূজা করেন। কিন্তু সনকার এই আশাভঙ্গের কারণ হয় স্বামী চন্দ্রধর। কেননা তিনি শিবের ভক্ত। মনসার প্রতি তার অবজ্ঞা। তাই তিনি হেঁতালের লাঠি দিয়ে মনসার ঘটবারি ভেঙে দেন। সনকা নীরবে সহ্য করেনি, স্বামীর এই আচরণের প্রতিবাদ করেছে-

'সনকা বলেন বান্যা গেলে ছারে খারে।
দেবতা সহিত বাদ কোন মূর্খে করে।।'[৯]

ধন্বন্তরি ওঝার মৃত্যুর পরেও চাঁদের মনে বিন্দু মাত্র শঙ্কা নেই। তবুও তিনি দেবীর পূজায় অসম্মতি প্রদর্শন করলেন। পুনরায় মনসার কোপে চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু। এই সময়ে আমরা সনকার বেদনাতুর হৃদয়ের ছবিটা দেখি-

'সনকা বান্যানী কান্দে নাহি বান্ধে চুল।
ধূলায় ধূসর তনু কান্দে শোকাকুল ।।'[১০]

ছয় পুত্র হারিয়ে শোকাকুল সনকা দীর্ঘদিন পরে পুত্র লখিন্দরকে পেলেন। পুত্র লখীন্দরকে তিনি আর কোন ভাবেই হারাতে চান না। স্বামী চন্দ্রধর বানিজ্যে গেছে, এমতবস্থায় লখীন্দরের জন্ম। স্বামীর অনুপস্থিতিতে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এই স্নেহের পুত্রের যখন বাসর ঘরে সর্প দংশনে মৃত্যু হল, তখন সনকা নীরব থাকতে পারেনি। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। লখীন্দরের মৃত্যুতে সনকাকে এবার অভিযোগ করতে শোনা যায়, কিন্তু সে অভিযোগ মনসার বিরুদ্ধে নয়। সে অভিযোগ বর্ষিত হল স্বামী চাঁদ সদাগরের বিরুদ্ধে -

'দেবতা সহিত বাদ কত কৈলু অপরাধ।
পাপ চক্ষে তারে নাঞি চিনি ।।
পরম দারুণ শোকে মুখ দেখাইতে লোকে
বড় লজ্জা হইল আমার।।
সাতপুত্র শোকে আমি পাইলে প্রবেশ ভূমি
যদি ক্ষিতি হএ বিদার।।'[১১]

তৎকালীন সময়ে পরিবারের নারী ছিল পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী। নারীর নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব ছিলনা। প্রবল প্রতাপী চাঁদের স্ত্রী হিসেবে সনকারও কোন ব্যক্তিত, ইচ্ছা, মতামত এগুলো থাকবে এমন ভাবাই যায় না। কিন্তু তবুও বলতে হয় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে সনকার ব্যক্তিত্বময়ী রূপটি কিছুটা হলেও প্রকাশ করেছেন। তাইতো স্বামী বিদেশে বানিজ্যে, গর্ভবতী সনকা বলতে পেরেছেন –

'পাই মিঠা তোক তাহে পাই ভোক,
গ্রাস দুই চারি ভুঞ্জি ।।
সরল সফরী ভাজা গোটা চারি ।
বোদালি গীমার সনে ।।'[১২]

এমনকি পুত্র লখিন্দরের বিবাহের সময়তে প্রতাপী চাঁদকেও সনকার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে যুক্তি করতে হয়েছে –

'সনকা সহিত যুক্তি করে সদাগর।
বিভাব নাএক হৈল পুত্র লখীন্দর।।
কোথা বিভা দিব কহ সনকা বান্যানী।
কিঙ্কর পাঠায়্যা সাধু পুরোহিত আনি ।'[১৩]

এখানেই শেষ নয়, ঘটক দ্বিজ জনার্দন যখন বেহুলার বর্ণনা করেছেন; তখন সনকাকে বলতে শুনি-

'সনকা বলেন হেন অহে দ্বিজ জনার্দন।
কেমন দেখিলে কন্যাখানি।।
কত বয়ক্রম তার কোন গ্রামে কন্যা কার ।
কহ তার বিবরণ শুনি।।
যদি কন্যা হয় ভাল আমার সদনে বল।
শুনহ ঘটক জনার্দন।।'[১৪]

তখন জনার্দন সুরসুর করে বেহুলার সমস্ত বর্ণনা সনকাকে বলেছে। এটা যে নিতে পেরেছে তৎকালীন নারী সেটা তার স্বাধিকার বোধকেই আমাদের স্মরণ করে দেয়। কেতকাদাসের কাব্যে সেই সময়ে সনকা যে এটা আদায় করে নিতে পেরেছেন, এতে তাঁর কিছুটা হলেও সনকার ব্যক্তিত্বময়ী রূপটিই প্রকাশ পেয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের এক উল্লেখ যোগ্য চরিত্র হল বেহুলা। মূলত এই চরিত্রকে সামনে রেখেই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য দেবী মনসার পূজা প্রচার সেটা সাধিত হয়েছে। এই বেহুলার পূর্ব ইতিহাস আমরা জানি। সে শাপভ্রষ্টা ঊষা, দৈত্যরাজ বাণের কন্যা। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে লখীন্দরের জন্মের পরেই বেহুলার জন্ম হয়েছে। নিছনি নগরের সায় বনিক তার পিতা, জননী অমলা। কেতকাদাস বেহুলার রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন –

'চাঁদ মুখী খঞ্জন নয়ানী কলাবতী।
অধর প্রবাল অঙ্গ বিদ্যুতের জুতি।।
কুটিল কুন্তল পাশ খোঁপায় বকুল।
তাহে বসি মকরন্দ পিএ অলিকুল।।
সদাই আনন্দ করে কুরঙ্গ সমান।
আক্ষটির ফাঁদ জিনি তার দুই কান।।'[১৫]

পরবর্তীতে দেখা যায়, চন্দ্রধরের পুত্র লখিন্দরের জন্য বেহুলাকে দেখতে আসেন। পাত্রী নির্বাচনের জন্য তিনি বেহুলাকে পতিব্রত্যের পরীক্ষার কথা বলেন। আসলে দেবী মনসার ছলনা থেকে পুত্রকে রক্ষা করার জন্য চন্দ্রধরের এই ব্যবস্থা। তিনি বেহুলাকে সতীত্বের পরীক্ষা করাতে চাইলেন। পরীক্ষাটি ছিল এই রকম, চন্দ্রধর লোহার কলাই দেবেন বেহুলাকে তা সুসিদ্ধ করে নরম করে দিতে হবে। এই পরীক্ষার কথা শুনে সায়বেনে ও অমলা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেহুলা একটুও কাতর হননি। এই পরিস্থিতিতে বেহুলা বলতে পেরেছিল-

'বেহুলা কহিল মাতা না কর ক্রন্দন।
লোহার কলাই আমি করিব রন্ধন।।'[১৬]

মুক্তা সরোবরে সখীদের সঙ্গে জলক্রীড়ায় মত্ত বেহুলার পায়ের জল লেগেছিল বৃদ্ধা বেশে বসে থাকা মনসার গায়ে। মনসা বেহুলাকে অভিশাপ দিল 'বাসরে মরিব পতি পাবে মননস্তাপ'।[১৭] তা সত্ত্বেও বেহুলার বিবাহ হল। দেবতার বিরুদ্ধে তার এই প্রতিবাদ। চাঁদ যখন বেহুলার প্রতিব্রত্যের পরীক্ষা নিতে চাইলেন, বেহুলা তখন শুদ্ধ মনে পুকুরে স্নান করতে গেল। দেবী মনসা এই সময় অভিশাপ দেওয়ার জন্য ঘাটের কিনারে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে বসে ছিলেন। বেহুলা ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়লে, গোড়ালির পানি ছিটকে গিয়ে গায়ে লাগে মনসার। এই ঘটনা দেবী মনসা বেহুলার অহংকার ভেবে কটুবাক্য বলতে লাগলেন। বেহুলাও ছদ্মবেশী মনসাকে চিনতে না পেরে দম্ভের সঙ্গে বলেছিলেন-

'বেহুলা কহিল আমি সায়বান্যার ঝি।
বাপের পুখুরে নাই তোরে পাইল কি।।'[১৮]

এই উক্তিতে বেহুলা চরিত্রের যুক্তিবাদী ও স্পষ্টভাষী রূপটি প্রকাশিত।

শুধু এখানেই নয়, স্বামী লখিন্দরের মৃত্যুর পর সকলের অনুরোধ বেহুলা প্রত্যাখ্যান করে আপন ইচ্ছা ও সংকল্পকে আঁকড়ে ধরে থেকে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। সেখানেও তাঁর এই আত্মবিশ্বাসের ছবিটি পরিস্ফুট হয়েছে-

'যদি জীএ মোর প্রাণনাথ,
সাধিব কুলের ধম্ম যত অভিলাষ কম্ম
ইথে কেহ না করিহ মানা।।'[১৯]

লখীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার কোন দোষ ছিলনা। কিন্তু বেহুলার মৃত্যু সংবাদে পাড়াপড়শি এমনকি সনকার দ্বারাও শুরু হয় বেহুলার উপর মানসিক অত্যাচার। সনকা তো সরাসরি বেহুলাকে বলেই দিলেন-'খণ্ড কপালিনী চিরুনিয়া দাতী' বলে উল্লেখ করেছেন। সনকার কথা মতো বেহুলাই যেন লখীন্দরকে সর্প রূপ ধরে দংশন করেছে। এই সময় বেহুলার অন্তর ছারখার হলেও, সনকা ও পাড়াপড়শির অভিযোগে বেহুলা আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছে-

'জীয়াইব মৃত পতি রাখিব কুলের খাতি।
কহি সত্য নাহি উপহাস।।'[২০]

এমনকি বেহুলার সমাজ বাস্তবতার জ্ঞানও ছিল প্রচুর। কেননা বেহুলার দাদারা এসে নদীতে ভাসমান বেহুলাকে দেখে কাতর হন। দাদারা পরামর্শ দেয় মৃত্যু দেহ পরিত্যাগ করে তাদের গৃহে ফিরে আসতে। তারা এও জানায় যে সাত ভাইয়ের সংসারে বেহুলার কোন অসুবিধা হবেনা। কিন্তু সমাজঅভিজ্ঞ বেহুলা জানে, বিয়ের পর দাদাদের সংসারে আগের মতো মুল্য পাবেনা। আর এই জন্যই বেহুলা বলেছিলেন-

'বেহুলা কহিল আমি হই কাড়্যা রাঁড়ী।
কতনা পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি।।
মা বাপের বাড়ি মোরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাউজ সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে।।'[২১]

অতঃপর বেহুলা মৃত স্বামী লখীন্দরকে নিয়ে স্বর্গের পথে যাত্রা করে। এই যাত্রা পথও খুব একটা মসৃণ ছিল না। ছিল নানা বিপদ ও প্রলোভন। বেহুলাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য দেখা যায় নানান ঘাটে নানা পুরুষ অবস্থান করেছে। এইভাবে ঘোর অন্ধকার বিপদে পড়লেও বেহুলার বুদ্ধি, ধৈর্যনাশ হয়নি। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছিল।

এরপর নেতর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যেও আমরা আর এক বেহুলাকে খুজে পাই। সেখানে তার বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় মেলে। অজানা অচেনা পরিবেশে মানুষের মন কীভাবে জয় করতে হয় বেহুলা তা জানে। তাইতো সে নেতকে মাসি বলে সম্বোধন করে নেতর মন জয় করে নিয়েছে। আর এই আত্মীয়তার সুতো ধরেই বেহুলা দেবসভায় সহজেই হাজির হতে পেরেছে। দেবকুলের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে শুধু মৃত স্বামী নয়, চম্পকনগরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল ছয় ভাসুরসহ চোদ্দ ডিঙ্গাও। এমনকি চাঁদও পুত্র বধূর এই সাফল্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে বেহুলার অনুরোধে ডান হাতে হলেও মনসার পূজা দিয়েছিলেন। বেহুলা শেষ পর্যন্ত হারল না। দেবতা ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে সে সফল হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছে বেহুলার জেদ, প্রতিবাদী সত্তা।

আমরা জানি লৌকিক দেব–দেবীর মাহাত্ম্য উপলক্ষ করে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এক শ্রেণির কাব্য গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের সময়সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন– 'আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শাতাব্দীর কবি

ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্ম বিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।'[২২]

মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের ভুঁইফোঁড় কোন বিষয় নয়। এগুলি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব ফসল। এর বিষয় অনুবাদ সাহিতের মত অন্য ভাষা থেকে গৃহীত হয়নি। এতে প্রতিফলিত সমাজ জীবনের সঙ্গে সর্বভারতীয় পরিমণ্ডলের পরিবেশ সে ভাবে যুক্ত নয়। বরং বলা যায় এই কাহিনিতে আছে লোকায়ত বাংলার এক নিবিড় সম্বন্ধ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি অভিযানের অব্যবহিত পরে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্য কর্তৃক জর্জরিত নিম্নবর্ণের অবহেলিত হিন্দুরা ইসলামধর্মের সাম্যবাদের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কারণে বাংলার সমাজজীবন ছিল সমস্যা জর্জরিত। পরবর্তীতে ১৩৪২ খ্রিঃ এ সামসুদ্দীন ইলিয়াসশাহ বাংলার স্বাধীন সুলতান রাজ্য স্থাপিত করলে দেশ অনেকটা ঐক্যবদ্ধ এবং রাষ্ট্রনৈতিক অশান্তি দূরীভূত হল। এই সময়ে আবার নতুন করে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভবনা দেখা দিল। আর উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ উপলব্ধি করলেন বাইরের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে নিম্নবর্ণের সঙ্গে একটা আপস দরকার। ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সংযোগ সাধনের চেষ্টা লক্ষ্য করা গেল। নিম্নবর্ণের পূজিত দেবতাগণ উচ্চবর্ণের দ্বারা সমাদৃত হলেন। যে অনার্য দেব–দেবীরা উচ্চস্তরে স্থান পেয়ে মঙ্গলদেবী রূপে পরিচিত হলেন, তাঁদেরই নিয়ে রচিত ও প্রচারিত মাহাত্ম্যমূলক কাব্যই হল মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম। সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনি বর্ণনা করাই মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তুর্কি অভিযানের পটভূমিকায় বাংলাদেশের উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজকে নিজেদের দুর্গ শক্তিশালী করার প্রতিক্রিয়ায় নিম্নবর্ণের অনেক আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। উচ্চবর্ণের প্রতিভূ চাঁদ সদাগর মনসাদেবীর শত নির্যাতন, বিড়ম্বনার মধ্যেও মাথা নিচু করেনি। অবশেষে স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে বামহাতে মনসার পূজা দেন।

এই আখ্যানগুলি আমাদের সমাজ ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। পুরুষশাসিত সমাজের কথা এখানে আছে কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্য আসলে নারীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য স্বাভাবিকভাবেই এসেছে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিবাদীসত্তার স্বরূপ। নারীও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে প্রয়োজনে নারীও প্রতিবাদী, প্রতিরোধে, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের আলোচ্য কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলকাব্যটি। এখানে মনসা, সনক, বেহুলা প্রমূখ নারী চরিত্র তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, বুদ্ধিমত্তায, আত্মসচেতনতাই আমাদের মন কেড়ে নেয়। সমাজ সংস্কার পরিবারের নানা কঠোর অনুশাসন এর বিরুদ্ধে তাদের এ স্বাধীকারবোধ আমাদের বারে বারে বিস্মিত করে আমাদের ভাবায়।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গীতবিতান (নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা), বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৭০৫।
২. কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত(সম্পাদিত), লেখাপড়া,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ পৃ-১৯
৩.তদেব; পৃ-৭৯
৪.তদেব; পৃ-১৩০
৫.তদেব; পৃ-৮৩
৬.তদেব; পৃ-১৬৭
৭.তদেব; পৃ-২৫৬
৮.তদেব; পৃ-২৭৫
৯.তদেব; পৃ-১৪৯

১০.তদেব; পৃ-১৮৭
১১.তদেব; পৃ-২৬০
১২.তদেব; পৃ-২৩৭
১৩.তদেব; পৃ-২৪১
১৪.তদেব; পৃ-২৪৩
১৫.তদেব; পৃ-২৩৯
১৬.তদেব; পৃ-২৪৪
১৭.তদেব; পৃ-২৪৫
১৮.তদেব; পৃ-২৪৪
১৯.তদেব; পৃ-২৬১
২০.তদেব; পৃ-২৬০
২১.তদেব; পৃ-২৬৪
২২.ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখাজী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম যৌথ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ৮

সহায়কগ্রন্থ:

১. কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত(সম্পাদিত), লেখাপড়া,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪।
৩. পোদ্দার, অরবিন্দু, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৯।
৪. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা, হাউস অফ বুকস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭।
৫. গোস্বামী, অমিতাভ, মঙ্গলকাব্যে লোকজীবন ও লোকভাবনা, সোপান পাবলিশার, কলকাতা, প্রথম ২.ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখাজী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম যৌথ প্রকাশ, মে ২০১৫। প্রকাশ, ১৯৫৭।